শ্রীরণেশ বাগচী



বীরসন্ন্যাসী বিবেকানন্দ

বীরসন্ন্যাসী বিবেকানন্দ

শ্রী রণেশ বাগচী

78

B·P

ভোলানাথ প্রকাশনী
৩৭/১১, বেনিয়াটোলা লেন • কলিকাতা-৯

প্রকাশক ঃ
স্বরেশ দাশ
ভোলানাথ প্রকাশনী
৩৭।১১, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ-শিল্পী
বিন্দু পাল

দাম— ৮-৫০

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীজগন্নাথ পান
শান্তিনাথ প্রেস
১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

“হে ভারত—ভূলিও না—তোমার নারী জাতীর আদর্শসীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ; *** ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মেথর,, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই ; বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসা আমার ভাই, তুমিও কটি’ মাত্র—বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে



ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমাদের শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী ; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিন রাত, “হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও ; মা দুর্বলতা—কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।”

স্বামী বিবেকানন্দ

রাজস্থানের খেতরীগ্রামে একজন সুন্দর যুবা সন্ন্যাসী এসেছেন। অনেক দূর দূর গ্রাম থেকে বুড়ো-বুড়ি, ছোট ছেলে-মেয়েরা সবাই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। একটি গাছের নীচে বসে সন্ন্যাসী প্রত্যেকের সুখ-দুঃখের কথা শুনছেন, সকলের সঙ্গে নানা রকম ধর্মের কথা আলোচনা করছেন। আশীর্বাদ যারা নিতে এসেছে তাদের আশীর্বাদ করছেন।

এইভাবে তিনদিন তিনরাত পার হয়ে গেছে। সন্ন্যাসীর চোখে ঘুম নেই, পেটে অন্ন নেই—এমনকি জল পর্যন্ত খাননি। কিন্তু এত কষ্টেও তাঁর চোখে-মুখে ক্লান্তির ছাপ পড়েনি এতটুকু।

অবশেষে সমস্ত লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ শেষ হবার পর রাত্রিবেলা একটি বুড়ো লোক সাধুবাবার কাছে এসে বললো ;—

"সাধুবাবা, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।"

সাধুবাবা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কেন ?"

বুড়ো বললো খুব ভয়ে ভয়ে, "তিনদিন তিনরাত আপনি

কিছু আহার করেননি, ঘুমোননি, এখন আপনার নিশ্চয় খুব ক্ষিধে পেয়েছে ?”

সাধুবাবা হেসে বললেন, “তা পেয়েছে। কিন্তু তুমি কি আমার জন্যে কিছু খাবার আনতে পারবে ?”

এইবার বুড়ো ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। সে কথার উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলো।

জিজ্ঞেস করলেন সাধুবাবা, “কি হলো ? তুমি কি আমার জন্যে কিছু খাবার আনতে পারবে না ?”

বুড়ো বললো, “তা নয় সাধুবাবা, আপনি কি আমার ছোঁয়া খাবার খাবেন ?”

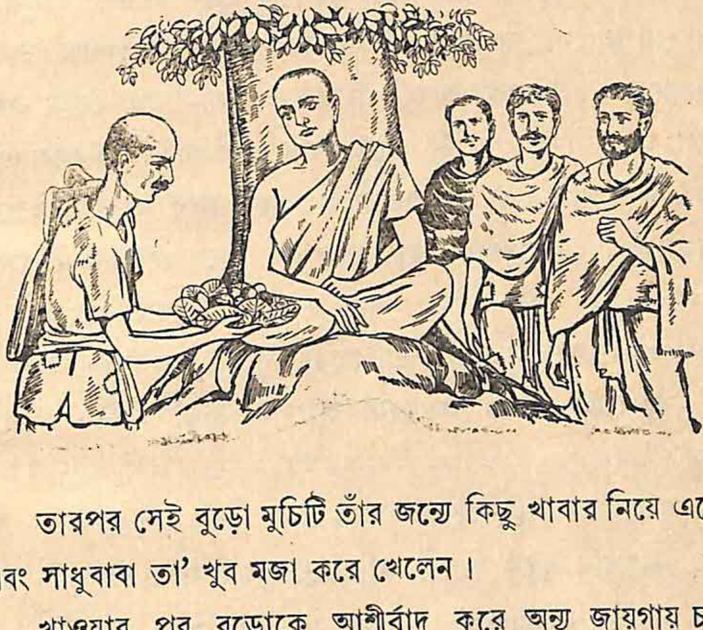
অবাক হলেন সাধুবাবা, “কেন ?”

—“আমি একজন মুচি। জুতো সারাই, সেলাই করি।”

সাধুবাবা এই কথা শুনে ভীষণ হেসে উঠলেন। বললেন, “তাতে কি হয়েছে ? আমি ও সব বিশ্বাস করি না ; মানিও না। তুমি নিয়ে এসো আমি নিশ্চয় খাব।”

বুড়ো এবার সত্যি সত্যি ভয় পেয়ে গেল। বললো, “মহারাজ জানতে পারলে আমাকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেবেন।”

সাধুবাবা তাকে অভয় দিলেন, "তোমার কোন ভয় নেই। মহারাজ তোমাকে কিছুই বলবেন না।"



তারপর সেই বুড়ো মুচিটি তাঁর জন্যে কিছু খাবার নিয়ে এলো এবং সাধুবাবা তা' খুব মজা করে খেলেন।

খাওয়ার পর বুড়োকে আশীর্বাদ করে অন্য জায়গায় চলে গেলেন।

কিছুদিন যাবার পর একদিন হঠাৎ সেই মহারাজার পেয়াদা

সেই বুড়ো মুচির কুঁড়ে ঘরে এসে হাজির হলো। তাকে ডেকে বললো,—"মহারাজ ডেকেছেন।"

বেচারী বুড়ো তো ভয়ে কাঁপতে শুরু করলো। বুঝতে পারলো যে সেই সাধুবাবাকেই খাওয়াবার জন্যে মহারাজ তাকে ডেকেছেন। অনেক কাকুতি-মিনতি করলো কিন্তু কোন ফলই হলো না। সেই পেয়াদা তাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল এবং মহারাজার সামনে হাজির করলো। মহারাজার দিকে চাইতেই সে দেখলো যে সাধুবাবা মহারাজার পাশে বসে রয়েছেন। তাঁকে দেখা মাত্রই সেই মুচির সমস্ত ভয় কেটে গেল নিমেষে। সে মহারাজা ও সাধুকে প্রণাম জানিয়ে একপাশে সরে দাঁড়ালো।

মহারাজা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি এই সাধুকে চেন?"

মুচি উত্তর দিল, "হ্যাঁ মহারাজ।"

—"তুমি এঁকে আহার করিয়েছ এ কথা সত্যি?"

—"হ্যাঁ মহারাজ।"

—"এর জন্যে তোমাকে শাস্তি পেতে হবে তুমি জান?" জিজ্ঞেস করলেন মহারাজ।

বুড়ো কিন্তু এতেও ভয় পেলো না। বললো, "জানি মহারাজ। কিন্তু সাধুবাবা তিনদিন অনাহারে আছেন, জল পর্যন্ত খাননি, একটুকু সময়ের জন্যে বিশ্রাম পর্যন্ত পাননি। এই ভেবে আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। সেইজন্যে তাঁকে আমি খাবার খাইয়েছিলাম। ভেবেছিলাম এর জন্যে যদি আমায় শাস্তি পেতে হয় সেও ভাল।"

এ কথা শুনে মহারাজ খুব সন্তুষ্ট হলেন।

হেসে বললেন, "আমি তোমাকে সাজা দেব না। পুরস্কার দেব।"

পরে মহারাজা তাকে পুরস্কার দিয়েছিলেন এমন, যে তার আর কোনও কিছুর অভাব পরে হয়নি।

এই জাত-বিচার যে সাধুবাবা মানতেন না, যে সন্ন্যাসীকে নিয়ে এত কাণ্ড হয়ে গেল তাঁর নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। পরে এই নরেন্দ্রনাথ দত্তই বিশ্ববিখ্যাত ভারতের সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ নামে পরিচিত হয়েছিলেন। এতবড় ঈশ্বর এবং ধর্মবিশ্বাসী পুরুষ পৃথিবীতে খুব কম জন্মগ্রহণ করেছেন।

নরেনের বাবা ছিলেন তখনকার দিনের একজন নামকরা

উকিল। নাম ছিল বিশ্বনাথ দত্ত। মা ছিলেন ভুবনেশ্বরী দেবী। কলকাতার সিমুলিয়ায় বিখ্যাত দত্তবাড়ীর লোক এঁরা।

এই বিশ্বনাথ দত্ত ও ভুবনেশ্বরী দেবীর কোনও পুত্র সন্তান ছিল না। কেবল দু'টি কন্যা ছিল। একটি পুত্র সন্তানের জন্যে তিনি বড় ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন। প্রায়ই মন খারাপ করে কাজকর্ম করতেন। নানারকম দেব-দেবীর কাছে মানত করতেন, নানারকম কঠিন ব্রত পালন করতেন। কিন্তু কোন কিছুতেই তাঁর কামনা পূর্ণ হচ্ছিল না। সেই সময় দত্ত পরিবারের এক আত্মীয়া কাশীতে থাকতেন। অবশেষে ভুবনেশ্বরী দেবী তাঁর সাহায্যে সেই কাশীর বিশ্বনাথের কাছে প্রতিদিন পূজোর ব্যবস্থা করলেন এবং কোলকাতাতেও তিনি দিনরাত মহাদেবের পূজোয় ব্যস্ত থাকতেন।

এইভাবে যখন দিন চলে যাচ্ছে সেই সময় একদিন সকালে ভুবনেশ্বরী দেবী শিবের ধ্যানে বসলেন। সকাল পার হয়ে দুপুর গড়িয়ে গেল তবুও তাঁর ধ্যান ভাঙলো না। সন্ধ্যা পার হয়ে গেল, রাতও গভীর হলো, শেষে তিনি এক সময় ঘুমিয়ে পড়লেন এবং এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন। দেখলেন, স্বয়ং মহাদেব তাঁর

সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। একটু পরে তিনি ছোট্ট শিশু হয়ে ভুবনেশ্বরী দেবীর কোলে আশ্রয় নিলেন!

সেদিন পৌষ সংক্রান্তি। ইংরেজী ১৮৬৩ সালের ১২ই জানুয়ারী ভোরবেলায় সিমুলিয়ার দত্তবাড়ীর সকলের মুখে হাসি ফুটলো। কারণ আজ ভুবনেশ্বরী দেবীর অনেক দিনের আশা পূর্ণ করে দেবাদিদেব মহাদেব তাঁকে পুত্র সন্তান দান করেছেন।

কে জানতো যে এই শিশুই বড় হয়ে বিবেকানন্দ হবে? বাংলাদেশকে, ভারতবর্ষকে সম্মানের আসনে বসাবে?

যাই হোক, ছোটবেলায় নরেন্দ্রনাথের ডাকনাম ছিল বীরেশ্বর। লোকমুখে সেটা হয়ে গিয়েছিল 'বিলে'। বিলে নামেই সকলে তাঁকে ডাকতো।

বালক নরেন কিন্তু খুব শান্তশিষ্ট ভাল ছেলে ছিলেন না। ভীষণ অশান্ত, চঞ্চল এবং দুষ্টু ছিলেন। বাড়ীর লোক তাঁকে শাসন করতে হিমসিম খেয়ে যেত, পাড়ার লোক অতিষ্ঠ হয়ে উঠতো। নীচের ঘটনাটি থেকেই জানা যায় যে বিলে কত দুষ্টু ছিলেন।

একদিন বিলেকে দুষ্টুমী করার জন্যে তাঁর দিদিরা মারতে

এলেন। বিলে তাড়াতাড়ি কাছেই একটা নর্দমার মধ্যে নেমে পড়ে সারা গায়ে নোংরা কাদা-পাঁক মেখে দিদিদের সামনে গিয়ে খুব হাসতে লাগলেন। আর বলতে লাগলেন, "কৈ আমায় মারতো দেখি ?"

দিদিরা বিলের নোংরা পাঁক মাখা দেহ ছুঁলেন না ভয়ে। পাছে তাঁরা অশুচি হয়ে যান! তাই নিরুপায় হয়ে তাঁরা ফিরে গেলেন।

ছোটবেলা থেকেই লক্ষ্য করা যেত যে এই ছেলেটার মধ্যে শুধু ভয় ছাড়া দয়া, মায়া, ভালবাসা সবকিছুই ছিল।

নীচের ঘটনাটা জানলে বালক নরেনের সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। একদিন কোলকাতা শহরের একটি রাস্তায় ভীষণ ভীড়, একটি ঘোড়ার গাড়ী আসছিল সেই ভীড়ের মধ্যে দিয়ে। হঠাৎ সেই ঘোড়ার গাড়ীর ঘোড়াটা ভীষণ ক্ষেপে গেল। রীতিমত দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিল। রাস্তায় লোকজন খুব ভয়ে যে যেদিকে পারলো ছুটে পালালো। গাড়ীর কোচয়ানও পড়ে গেল গাড়ী থেকে। গাড়ীর সওয়ারী এক মহিলা। তিনি ভয়ে ভেতরে বসে কাঁদতে শুরু করে দিলেন। কে তাঁকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করবে? সবাই দিশেহারা। কারোর মাথায় কোন বুদ্ধি

আসছে না। কেউ ঢিল ছুঁড়ছে, কেউ লাঠি মারছে, তাতে ঘোড়াটা আরও বেশী ক্ষেপে উঠছে। এমন সময় হঠাৎ কোথা থেকে নরেন ছুটে এসে ঐ পাগলা ঘোড়াটার পিঠের ওপর লাফিয়ে চড়ে বসলেন। ঘোড়াটা সঙ্গে সঙ্গে শান্ত হয়ে গেল। তারপর ভেতর থেকে মহিলাটি বেরিয়ে এসে নরেনকে খুব আশীর্বাদ করে বিদায় নিলেন। আর পথচারীরা ঐটুকু বালক নরেনের সাহসের তারিফ করতে করতে চলে গেল।

কেউ বিপদে পড়লে নরেন জীবন তুচ্ছ করে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। আর একদিন আর একটা ঘটনা ঘটলো। নরেনের বয়স তখন মাত্র ছয় বছর। সেদিন বাড়ীর লোকদের সঙ্গে তিনি চড়কের মেলা দেখে ফিরছেন। হাতে তাঁর একটা শিব ঠাকুরের মূর্তি। সঙ্গে কয়েকটি ছোট ছেলেও ছিল। হঠাৎ একটা ছেলে রাস্তার মাঝখানে কখন চলে গেছে। আগে থেকে কেউ খেয়াল করেনি। যখন একটা ঘোড়ার গাড়ী একেবারে সামনে এসে গেছে তখন সকলের নজর পড়লো। কিন্তু নজর পড়লে কি হবে? ঐ বিপদের মুখে যাবে কে? সবাই শুধু চিৎকারই করলো, "গেল, গেল"। সহসা ব্যাপারটা বিলের নজরে পড়লো। তিনি বুঝতেও

পারলেন যে বিপদটা কতখানি। দুবার তাঁকে আর ভাবতে হলো না। হাতে যে শিবমূর্তিটা ছিল সেটাকে বগলে চেপে চোখের নিমেষে দৌড়ে গেল গাড়ীটার সামনে। ছেলেটাকে মুহূর্তের মধ্যে সরিয়ে দিলেন গাড়ীর সামনে থেকে। একটু দেরী হলেই ঐ গাড়ীর নীচে নরেন এবং ঐ ছেলেটা দুজনেই পিষে যেতেন। কিন্তু ঐ দুরন্ত সাহস আর ভীষণ বুদ্ধির গুণে নরেন ছেলেটাকেও বাঁচালেন নিজেও বাঁচলেন।

জাতিভেদকে বালক বয়সেই নরেন অন্যায় মনে করতেন। একদিন একটা মজার কাণ্ড হলো।

বিশ্বনাথ বাবুর বৈঠকখানায় নানা জাতের মক্কেল আসতেন। তাঁদের প্রত্যেকর জন্যে আলাদা আলাদা রূপো বাঁধানো হুঁকো ছিল। একদিন নরেন অন্য জাতের এঁঠো খেলে কি হয় দেখবার জন্যে দুপুরে চুপি চুপি বৈঠকখানা ঘরে ঢুকে একটি একটি করে হুঁকো খেতে শুরু করলেন। আর লক্ষ্য করতে লাগলেন যে তাঁর কোনও পরিবর্তন হয় কি না। এমন সময় বাবা বিশ্বনাথ বাবু ঘরে ঢুকলেন। ছেলেকে ঐ অবস্থায় দেখে তিনি তো অবাক। জিজ্ঞেস করলেন, “কিরে কি করছিস ?” নরেন জবাব দিলেন,

"পরের এঁঠো খেয়ে দেখছিলাম কি হয় আমার। কিন্তু কৈ কিছুই তো হলো না। আমার তো জাত গেল না!"

বিশ্বনাথবাবু ছেলেকে কিছু বললেন না। মৃদু হেসে অন্য ঘরে চলে গেলেন।

তিনি ছিলেন অন্য ধরনের মানুষ। সেকালে হিন্দু সমাজের লোকেরা যেমন ছিলেন তিনি তেমনটি ছিলেন না। তিনি ছিলেন শিক্ষিত জ্ঞানী পুরুষ। দান, ধ্যান ও গান খুব ভালবাসতেন। হিন্দুধর্মের চিরকালের নিয়ম তিনি মানতেন না। যেখানে সেখানে অবাধে যাতায়াত করতেন। তাঁর গৃহেও সকলের আসা-যাওয়ার কোন বাধা-নিষেধ ছিল না।

নরেনকে বাড়ীর এবং বাইরের সকলেই ভালবাসতেন। বিশ্বনাথবাবুর মক্কেলরা তাঁকে সুন্দর সুন্দর ভ্রমণ কাহিনী শোনাতেন। কখনো কখনো তারা দুষ্টু নরেনের জন্যে নানা রকম খাবার আনতেন। নরেন তা খুব মজা করে খেতেন। একদিন এক মুসলমান মক্কেলের হাতে খাবার খেয়ে বাড়ীতে নরেন ভীষণ বকুনী খেয়েছিলেন। তাঁর মনে এই সময় নানা রকম প্রশ্ন উঁকি মারতো। চঞ্চল নরেন সেই প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করতেন তাঁর মা

ভুবেনেশ্বরী দেবীকে। আর ভুবনেশ্বরী দেবী প্রায়ই সেগুলোর মনের মতো উত্তর বালক নরেনকে দিতে পারতেন না, ফলে নরেন সেই কাজ আরও বেশী করে করতেন।

সে যুগে দুপুরে অবসর সময়ে বাড়ীর মেয়েরা রামায়ণ মহাভারত পড়ে আনন্দ লাভ করতো। দত্তবাড়ীতেও ভুবনেশ্বরী দেবী নরেনকে কোলে বসিয়ে কখনও রামায়ণ শুনাতেন, কখনও বা পাঠ করতেন। দুরন্ত বালক নরেনও সেই সময় বিভোর হয়ে একমনে পাঠ শুনতেন। অনেক সময় দেখা যেত যে একমনে রামায়ণের সুরে তিনি গান গেয়ে চলেছেন। কখনও দেখা যেত, মায়ের মতন তিনি শিব মূর্তির সামনে বসে পূজো করে চলেছেন। কখনো বা কয়েকটি বন্ধু জোগাড় করে শিবমূর্তিটিকে ঘিরে ধ্যানে বসেছেন।

একদিন এই রকম ধ্যান ধ্যান খেলতে খেলতে একটা সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটলো।

সেদিন বিকেলের শেষে কয়েকটি বন্ধু জুটিয়ে এনে নরেন ধ্যানে বসলেন তাঁর খেলার ঘরে। কিছুক্ষণ এইভাবে ধ্যান চলার পর একটি ছেলে চোখ খুলে হঠাৎ দেখতে পেল প্রকাণ্ড একটি সাপ

ফণা তুলে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তাই না দেখে সে ভয়ে ভীষণ চিৎকার শুরু করে দিল। তার চিৎকার শুনে যারা



ধ্যানের ভাণ করে ছিল সবাই দৌড়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু ধ্যান ভাঙলো না শুধু নরেনের। সাপ, এত গোলমাল কিছুই কানে গেল না তাঁর। একমনে তিনি ধ্যান করে চলেছেন। এদিকে আর সব ছেলেরা দৌড়ে গিয়ে বাড়ীর সকলকে খবর দিল। সকলেই এলেন। বিশ্বনাথবাবু, ভুবনেশ্বরী দেবীও এলেন। তাঁরা সবাই এই ব্যাপার দেখে অবাক! সবাই হতবুদ্ধি! সকলেই ভাবতে লাগলেন এই বোধ হয় ছোবল দিল সাপটি তাঁদের প্রিয়

'বিলে'কে ! কিন্তু না ! সাপটি কিছুই বললো না। বরং অতি শান্ত হয়ে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আকাশে চাঁদ উঠেছে। সেই চাঁদের আলো বালক নরেনের সর্বশরীরে ছড়িয়ে পড়েছে। মনে হচ্ছে, যেন এক মহাযোগী যুগ যুগ ধরে সাধনা করে চলেছেন—ঈশ্বরকে পাবার, সত্যকে জানবার !

ধ্যান ভাঙলে সবাইকে অমন ভাবে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তাঁকে সব কথা খুলে বলা হলে তিনি জানালেন ঘরে সাপটির আসা এবং যাওয়া কোনটাই জানতে পারেননি তিনি।

এই সব দেখে ভুবনেশ্বরী দেবীর মনে মাঝে মাঝে বড় ভয় হ'তো। ভয় পাবার কারণটিও অবশ্য একেবারে বাজে ছিল না। প্রথম কারণ সেই রাত্রের স্বপ্ন। আর দ্বিতীয় কারণ ছিল—নরেনের ঠাকুরদাদা—দুর্গাচরণ দত্ত। তিনি কোর্টের উকিল ছিলেন। কিন্তু সংসারের লোভ তাঁকে আটকাতে পারেনি। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে তিনি তাঁর স্ত্রী ও একমাত্র শিশুপুত্র বিশ্বনাথকে রেখে সন্ন্যাসী হয়ে চলে যান। এই কারণটি

ভুবনেশ্বরী দেবীকে বিশেষ করে ভাবিয়ে তুলতো। নরেনও কি তাহলে ওর ঠাকুরদাদার মতো এইভাবে সন্ন্যাসী হয়ে ঘর ছেড়ে চলে যাবে ?

ছয় বছর বয়সে নরেন স্কুলে ভর্তি হলেন। অশান্ত দুরন্ত ছেলেকে শাসন করতে মাস্টারমশাইরা একেবারে নাজেহাল হয়ে যেতেন। কিন্তু অশান্ত, দুরন্ত হলেও তিনি খুব মেধাবী ছিলেন। তাঁর ক্লাশের ছেলেরা যখন অ, আ, ক, খ···শিখছে বালক নরেন তখন রীতিমত লিখতে ও পড়তে শিখে গেছেন। রামায়ণ মহাভারতের বহু শ্লোক তাঁর মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল তাঁর মায়ের কাছ থেকে শুনতে শুনতে।

নরেনের মনের একাগ্রতা তাঁকে এক সঙ্গে অনেকগুলো কাজ করতে সাহায্য করতো। এ সম্বন্ধে একটা গল্প আছে।

একদিন ক্লাশে মাস্টারমশাই পড়াচ্ছেন। দুষ্টু নরেন তখন অন্য ছেলেদের সঙ্গে গল্পে মেতেছেন। মাস্টারমশাই অমনোযোগী ছাত্রদের ব্যবহারে ভীষণ রেগে গেলেন। সবাইকে ডেকে তিনি যা পড়াচ্ছিলেন সেই পড়া জিজ্ঞেস করলেন। কেউ পারলো না, পারলেন শুধু নরেন। গড় গড় করে তিনি সবটুকু বলে গেলেন।

মাস্টারমশাই খুব খুশী হলেন। তিনি সকলকে দাঁড়াতে বললেন —কেবলমাত্র নরেন ছাড়া। কিন্তু নরেন তা মেনে নিলেন না। মাস্টারমশায়কে বললেন, "স্যার, আমিও দাঁড়াবো।"

তিনি নিষেধ করলেন, তবুও তিনি শুনলেন না। বললেন, "না স্যার, আমিও তো ওদের সঙ্গে গল্প করছিলাম, তাই আমারও সাজা পাওয়া উচিত।" বলে নরেন অন্যান্যদের সাথে সমান ভাবে সাজা ভাগ করলেন।

পাঠশালার পাঠ শেষ করে তিনি উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। সমবয়সী বন্ধুদের নিয়ে একটা ছোটখাট দল গড়ে তুললেন। নানা রকম কাজকর্ম খেলাধূলা নিয়ে তাঁর এই দলটি সব সময় ব্যস্ত থাকতো। কিশোর নরেন ছিলেন এই দলের নেতা, তাঁর দলের দুষ্টু ছেলেদের শান্ত করতে একমাত্র তিনিই পারতেন। কারণ তাঁর শক্তি ছিল প্রচুর। সেই শক্তি অর্জন করতে তাঁকে রীতি-মত ব্যায়াম করতে হতো। নরেন খুব ভাল বক্সিং খেলা জানতেন। ক্রিকেট খেলাতেও তিনি খুব ওস্তাদ ছিলেন।

এই কিশোর বয়সে হঠাৎ উদরাময় রোগে আক্রান্ত হলেন নরেন। অমন বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য, মন সব ভেঙে যেতে লাগল। সদা

চঞ্চল, অশান্ত নরেন—শান্ত, ধীর হয়ে গেলেন। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত সেটা বুঝতে পারলেন। নিজের কাজের জন্য তখন তিনি মধ্যপ্রদেশের রায়পুর অঞ্চলে বাস করতেন। তিনি নরেনকে সেই খানেই নিয়ে যাবার জন্য ঠিক করলেন।

তখন মধ্যপ্রদেশের অনেক জায়গায় রেলগাড়ী যাওয়ার কোন রাস্তা ছিল না। নাগপুর স্টেশনে নেমে সেখান থেকে গোরুর গাড়ী করে রায়পুর পৌঁছতে প্রায় পনের দিনে সময় লাগতো। কোলকাতা থেকে রায়পুর যেতে অনেক পথ ঘুরে যেতে হয়েছিল। ফলে নরেন ভারতের অনেক গ্রাম, নগর দেখার সুযোগ পেলেন। এই সময়েই কিশোর নরেনের হৃদয়ের সঙ্গে প্রকৃতির গভীর যোগাযোগ ঘটলো। দীর্ঘপথ চলার সময় প্রকৃতির মনোরম শোভা দেখতে দেখতে আনন্দে তাঁর মন ভরে উঠতো। পাহাড়, নদী, মাঠ, গাছ-পালা যেন তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকতো। বনের ফল-ফুল, পাখীর ডাকে তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠতেন। প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলতেন। রায়পুরে থাকাকালীন পিতা বিশ্বনাথ নরেনকে নানা বিষয়ে জ্ঞান দিতেন। স্কুলের পাঠ্যবই ছাড়াও তিনি পুত্রের সাথে বিবিধ জ্ঞানের আলোচনায় মগ্ন

থাকতেন। সেখানে বিশ্বনাথের পরিচিতরা সকলেই লেখাপড়া জানতেন। তাঁদের গভীর আলোচনায় কিশোর নরেন অনায়াসেই যোগ দিতেন এবং তাঁর মতামত জানাতেন।

এইভাবে কিছুকাল থাকার পর নরেনের মন ও শরীর আবার আগের মতন ভাল হয়ে উঠলো। তিনি ফিরে এলেন তাঁর আগের পুরনো বন্ধুদের মধ্যে। আবার ভর্তি হলেন সেই বিদ্যালয়ে। বহুদিন বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকার জন্যে তাঁর দু'বছরের পড়া এক বছরে শেষ করতে বেশ কষ্ট হয়েছিল। কষ্ট হলেও নরেনই একমাত্র ছাত্র যিনি সেই স্কুলে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করেছিলেন।

তাঁর জানার ইচ্ছেই তাঁকে জ্ঞানী হতে সাহায্য করেছিল। জ্ঞানলাভের জন্যে অসাধারণ আন্তরিক ইচ্ছা, সময়ের সদ্ব্যবহার, কাজের একান্ত ইচ্ছা, পরের উপকার করা প্রভৃতি কতকগুলো বিশেষ গুণের জন্যে নরেন এক অসাধারণ চরিত্র গুণের অধিকারী হয়েছিলেন। একাগ্রতা ছিল তাঁর জীবনের একটি মহৎ গুণ। ভবিষ্যতে এই গুণ ভাল ভাবেই প্রকাশ পেয়েছিল। এইখানে নরেনের জীবনের একটি ঘটনা বর্ণনা করা যাক।

বিশ্বকোষ একটি প্রকাণ্ড জ্ঞানের বই। এই বই পড়লে পৃথিবীর সবরকম খবর জানা যায়। এর পঁচিশটি খণ্ড। নরেন বড় হয়ে এর দশটি খণ্ড পড়েছিলেন। প্রতিটি খণ্ডই খুব মোটা। তাতে অনেক পাতা।

একদিন নরেনের এক গুরুভাই গল্পে গল্পে বললেন, "কারোর পক্ষে এই প্রকাণ্ড বিশ্বকোষের সব কিছুই মনে রাখা সম্ভব নয়।"

—"বলো কি।" নরেন অবাক হলেন। বললেন, "আমি দশটা পড়েছি। এর মধ্যে থেকে যে কোন প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করো আমি উত্তর দেব।"

গুরুভাই তখন সেই বইগুলো থেকে নানা রকম কঠিন বিষয়ের প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। যুবক নরেন একটির পর একটি প্রশ্নের খুব সহজভাবে উত্তর দিয়ে গেলেন। শুধু তাই নয়, অনেক প্রশ্নের উত্তর দিলেন অবিকল বই-এ যেমন লেখা আছে তেমনি ভাবে। সেই গুরুভাই তো অবাক! তিনি শুধু একটি কথাই বললেন, "এ মানুষের ক্ষমতার বাইরে।"

নরেন বললেন, "তা'নয়। এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।

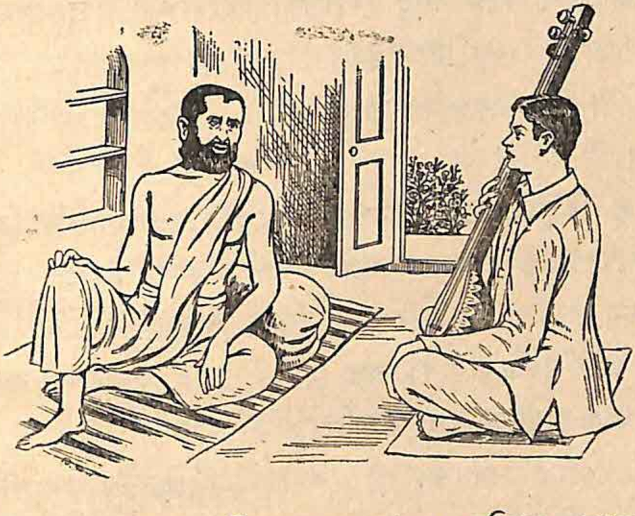
যে কোন লোক পারে যদি ব্রহ্মচর্য পালন করে। ব্রহ্মচর্য মানুষের ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়।"

প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশের পর নরেন কলেজে ভর্তি হলেন। কিন্তু শরীর খারাপের জন্যে একবছর পর সেই কলেজ ছেড়ে অন্য কলেজে ভর্তি হ'লেন। তাঁর অসাধারণ মেধা সমস্ত শিক্ষককে অবাক করে দিল। আবার এদিকে সদা হাসি-খুশী কিশোর নরেনের জীবনের পথ আরও বিচিত্র হয়ে উঠলো, পথ অন্যদিকে বেঁকে গেল।

নরেন যখন এফ, এ, পড়ছেন তখন স্বদেশী ও বিদেশী বহু নামকরা পণ্ডিতদের লেখা বই পড়ে শেষ করে ফেললেন।

নরেন যখন পড়াশুনায় এমনভাবে ব্যস্ত তখন একটা কাণ্ড হলো। দক্ষিণেশ্বরের পুরোহিত ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব একদিন এক ভক্তের নেমন্তন্ন রাখতে এলেন সিমুলিয়াতে। ভক্তের সকল আয়োজন পূর্ণ হয়ে যায় যদি তিনি একটি গায়ক পান। ঠাকুর গান শুনতে খুব ভালবাসেন। হঠাৎ ভক্তের নরেনকে মনে পড়লো। নরেন রীতিমত ভাল গান করেন। তখন সঙ্গে সঙ্গে তিনি নরেনকে ডেকে আনলেন। সুকণ্ঠ নরেনের। গান শুনে

ঠাকুর মোহিত হয়ে গেলেন। এইখানেই ঠাকুর রামকৃষ্ণের সঙ্গে নরেনের প্রথম দেখা হলো। পরিচয়ের সময় ঠাকুর তাঁর মধ্যে কি দেখতে পেয়েছিলেন কে জানে। তিনি যাবার সময়



বারবার করে তাঁকে দক্ষিণেশ্বরের মায়ের মন্দিরে যেতে বলে গেলেন।

কিন্তু নরেন যাবেন কি করে ? সামনে যে এফ, এ, পরীক্ষা ? লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকতে থাকতে তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাবার কথা

ভুলেই গেলেন। তা ছাড়া তখন ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাব বাংলাদেশে চলেছে। ঈশ্বর নিরাকার অথবা সাকার এই নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে তুমুল তর্ক চলেছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশব-চন্দ্র সেন এদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়েছে। ব্রাহ্মসমাজে নরেন যাতায়াত শুরু করেছেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা সভায় তিনি যোগ দেন—ব্রাহ্ম সঙ্গীত শুনিয়ে তিনি সকলকে আনন্দদান করেন।

এত কিছু হলেও তাঁর মনে একটা সন্দেহ দেখা দিল। এই যে বিশাল জগৎ আপন মনে চলেছে—কার নির্দেশে? কে চালাচ্ছেন আমাদের? নিশ্চয়ই কোন শক্তি? তিনি কে? কি? ঈশ্বর-রহস্য কি? এত লোক ঈশ্বর, ভগবান বলতে বলতে ঘুরে বেড়াচ্ছে—সত্যিই কি তিনি আছেন?

যে কোনও ধর্মসভা, যে কোনও ধর্ম প্রচারককে দেখতে পেলেই তিনি ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করেন, "আপনি কি ঈশ্বর দেখেছেন?"

তাঁরা সকলেই ভাবনায় পড়তেন এ প্রশ্নের উত্তর দিতে। কারোর কাছেই এই প্রশ্নের তিনি মনের মতো উত্তর পেলেন না।

অবশেষে তিনি একদিন মহাজ্ঞানী পণ্ডিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে যাবার জন্য স্থির করলেন। দেবেন্দ্রনাথ তখন গঙ্গা নদীতে নৌকা করে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। নরেন সেই নৌকোর ভিতরে গিয়ে হাজির হলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে সেখানে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই তিনি তাঁর সেই প্রশ্নটি করে বসলেন, "আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন ?"

দেবেন্দ্রনাথ চুপ করে গেলেন। এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড় শক্ত। তাছাড়া তিনি ঈশ্বরকে দেখেননি কোনদিন। ব্যর্থ হয়ে, নিরাশ হয়ে ফিরে এলেন নরেন। তবে মহর্ষি তাঁকে বললেন, "তুমি মহা যোগী হবে। ব্রহ্মজ্ঞানী হবে, ধ্যানের অভ্যাস কর তুমি।" কিন্তু তরুণ নরেনের মন ভরলো না। ভাবতে লাগলেন মহর্ষির মত জ্ঞানী লোক, ঈশ্বরপ্রেমিক লোক যখন ঈশ্বরকে দেখেননি তবে কি মিথ্যা ?

বাড়ী ফিরে অধৈর্য হয়ে উঠলেন তিনি। কি করবেন এখন ? কার কাছে যাবেন ? রাত্রে ঘুম আসছে না। হঠাৎ মনে পড়লো দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথা। দেখা যাক্ উনি কি বলেন। উনি তো মস্তবড় ভক্ত। তখন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

বাংলাদেশে পরম সাধক বলে পরিচিত হয়েছেন। লোকে তাঁকে শ্রদ্ধা করে, ভক্তি করে।

পরদিন ভোর না হতেই নরেন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে গিয়ে হাজির হলেন। দেখলেন ঠাকুরকে তাঁর শিষ্যেরা ঘিরে রয়েছেন—আর ঠাকুর তাঁদের সকলকে উপদেশ দিচ্ছেন। নরেনকে দরজায় দেখেই তিনি আকুল হয়ে উঠলেন, "হ্যাঁরে নরেন, এতদিন তুই আসিস্‌নি কেন? তোর জন্যে আমি পথ চেয়ে বসে আছি কতদিন ধরে—আর তুই আজ এলি? নে, আগে একটা গান কর।"

নরেন প্রথমটায় অবাক হয়ে গেলেন তাঁর ব্যবহারে। তারপর একটা ভজন গান শুরু করলেন। ঠাকুর চোখ বুঁজে চুপটি করে গান শুনতে লাগলেন। গান শেষ হলে ঠাকুর তাঁকে অন্য ঘরে নিয়ে গেলেন। অনেক কথা কইলেন ঠাকুর তাঁর সাথে। বললেন,—"নরেন, এ জগতে তুই কি জন্যে এসেছিস জানিস না।"

নরেন সে সব কথায় কান দিলেন না। তিনি সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলেন—"আপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন?"

ঠাকুর মৃদু হেসে ঘাড় নাড়িয়ে বললেন, "হ্যাঁ দেখেছি। তোকে যেমন দেখছি এর চেয়েও ভাল করে দেখেছি। কথা কয়েছি।"

নরেন বিশ্বাস করতে পারলেন না। ভাবলেন ঠাকুর বোধহয় পাগল।

রামকৃষ্ণ জিজ্ঞেস করলেন, "তুই দেখবি? আমি তোকে দেখাতে পারি। যদি আমি যা বলি তাই করিস।"

কিন্তু নরেনের এ সব বিশ্বাস হলো না। তিনি আবার আগের ব্রাহ্ম সমাজে ফিরে গেলেন। এইভাবে দিন চলতে লাগলো। নরেন মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে যান। কিছুক্ষণ থাকেন, তারপর আবার চলে আসেন।

এইভাবে বি-এ পরীক্ষা হয়ে গেল এবং নরেন পরীক্ষায় পাশ করলেন। এমন সময় একদিন নরেনের বাবা বিশ্বনাথ দত্ত মারা গেলেন। মারা যাবার সময় তিনি কিছুই রেখে যাননি। যুবক নরেন তখন মহাবিপদে পড়লেন। মা ও সংসারের অন্যান্যদের তিনি কি ভাবে খাওয়াবেন? নরেনের এবার একটা চাকরীর ভীষণ দরকার হয়ে পড়লো। দরজায় দরজায় চাকরীর জন্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কোথাও চাকরী পেলেন না। না খেয়ে তাঁর

দিন কাটতে লাগলো। মা খাওয়ার কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন—হয় নেমন্তন্ন খেয়েছি অথবা নেমন্তন্ন খেতে যাবো। কোন কিছুরই একটা ব্যবস্থা না করতে পেরে নরেন বড় ভেঙে পড়লেন। এই সময় আবার একটা নোতুন বিপদ দেখা দিল। তাঁদের বাড়ীটা নিয়ে শুরু হলো মামলা। অবশ্য নরেনের বুদ্ধির জন্যে তাঁদের জিত হয়েছিল এ মামলায়।

যাইহোক, বাড়ী বাঁচালো—কিন্তু খাবার জোগাড় করা মহা সমস্যা হয়ে পড়লো। নরেনের মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের কথা মনে হতো কিন্তু মনে-প্রাণে তাঁকে মানতে পারতেন না, বিশ্বাস করতে পারতেন না। কারণ তখন তিনি ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত করেন। নিরাকার ব্রহ্মেই তাঁর বিশ্বাস—দক্ষিণেশ্বরের মা কালীতে তাঁর বিশ্বাস নেই। মূর্তি পূজো তিনি মানেন না। কিন্তু শত চেষ্টা করেও তিনি দক্ষিণেশ্বরের পাগল ঠাকুরকে ভুলতে পারলেন না এবং শেষ পর্যন্ত একদিন গিয়ে হাজির হলেন।

রামকৃষ্ণ বললেন, "কিরে নরেন, কি মনে করে ?"

নরেন করুণ মুখে সব খুলে বললেন। বললেন, "আমার

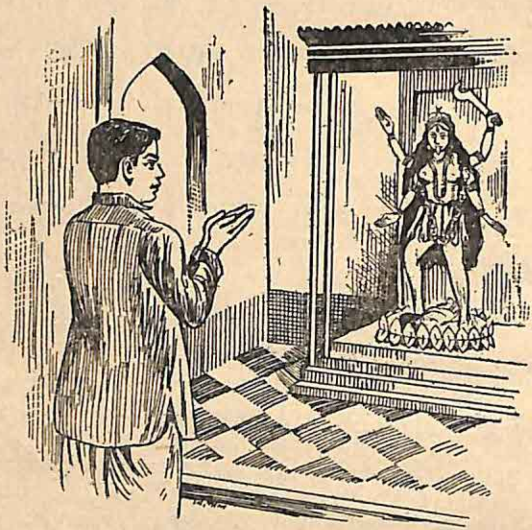
ভাই-বোনদের যাতে দু'বেলা দু' মুঠো খাওয়াতে পারি সেই জন্যে আপনার মাকে অনুরোধ করতে হবে।"

ঠাকুর মুখে গম্ভীর হলেন—কিন্তু মনে মনে হাসলেন। কেমন আসতে হলো কিনা! তারপর বললেন, "ঠিক আছে, আজ মঙ্গলবার। রাত্রে মায়ের কাছে যাবি। টাকা-পয়সা যা লাগে চাইবি। মা তোকে ঠিক দেবে।" বিকেল পার হলো। সন্ধ্যার আরতি শেষ হলো সন্ধ্যার সময়। রাতও এক প্রহর পার হয়ে গেল।

ঠাকুর বললেন, "যা এইবার মায়ের কাছে যা। গিয়ে তোর টাকা-পয়সা যা লাগবে চেয়ে নে।"

নরেন দুরু দুরু বুকে কালী মন্দিরের দিকে এগুলেন। মনে মনে একটু আনন্দিত হলেন এই ভেবে যে আজ থেকে তাঁর আর কোনও অভাব থাকবে না। মন্দিরে পৌঁছুলেন। দেখলেন মায়ের হাসির আলোয় সারা মন্দির আলো হয়ে উঠেছে। আলোয় ভরে গেছে তাঁর মন। তিনি ধীরে ধীরে মায়ের সামনে হাত জোর করে দাঁড়ালেন। বললেন, "মা, আমাকে জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, বিবেক দাও।"

চাওয়া হয়ে গেলেই মনে পড়লো তাঁর—একি করলেন তিনি ? টাকা চাইতে এসে একি চাইলেন তিনি ?



নরেন ফিরে চললেন আবার ঠাকুরের কাছে। বললেন, "ঠাকুর আমার একি হলো ?"

ঠাকুর মনে মনে হাসলেন। বললেন, "আবার যা। ঠিক করে ভাল করে মনে করে যা।"

নরেন আবার হাজির হলেন মায়ের সামনে। পাথরের মূর্তির সুন্দর হাসি। নরেনকে এবার টাকা চাইতেই হবে। তিনি জোর করে বললেন, "মা, আমাকে জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, বিবেক দাও।"

একি হলো! তাঁর টাকা! তাঁর টাকাতো চাওয়া হলো না। আবার ছুটে তিনি গেলেন ঠাকুরের কাছে। ঠাকুর একি হলো?

ঠাকুর বললেন, "আবার যা।"

আবার গেলেন নরেন। এবারেও সেই টাকা ভুলে তিনি চাইলেন জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক। তিনবারেও তিনি পারলেন না।

ঠাকুর বললেন, "তোর কপালে মা-ভাই-বোন নিয়ে সংসারে সুখ নেই। তবে তোর মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না।"

এর পর থেকে নরেন যেন কেমন হয়ে গেলেন। তিনি ঠাকুরের কাছ থেকে আর কোথাও যেতে পারলেন না। সারা মন জুড়ে রামকৃষ্ণ বসে রইলেন। নরেন শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন তাঁর।

এইভাবে দিন চলতে লাগলো। নরেনও সাধন পথে তাঁর উন্নতি করতে লাগলেন। ধর্ম নিয়ে, দেবতা নিয়ে লেখা বড় বড়

লেখকদের বই শেষ করে ফেললেন। সমস্ত শাস্ত্র পড়ে ফেললেন। এক মনে তাঁর এই সাধনা চললো।

এর মধ্যে ঠাকুর রামকৃষ্ণ মারা গেলেন। মারা যাবার সময় নরেনের ওপর অনেক দায়িত্ব দিয়ে গেলেন পালন করার জন্যে।

ঠাকুরের মৃত্যুর পর নরেন তাঁর গুরুভাইদের নিয়ে বরানগরের একটি বাড়ীতে চলে এলেন। কেন না ঠাকুর তাঁর ওপর সকলের দেখাশুনার ভার দিয়ে গেছেন। বরানগরের ভাঙা-চোরা বাড়ীতে সব সময়ই তাঁরা কীর্তন, নানারকম ধর্মের আলোচনা, শাস্ত্র আলোচনা এই সব নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। খাওয়া কোনদিন হতো—কোনদিন হতো না। থালা-বাসন কিছুই নেই বলে তাঁরা পাশের বাড়ী থেকে কলাপাতা লাউপাতা এ সব কাটতে গিয়ে ভড়ে মালীর গালাগালি শুনতেন। শেষে সবাই মান পাতায় ভাত খাওয়া শুরু করলেন। তাতে খুব গলা চুলকতো। এত কষ্ট—কিন্তু তাঁদের কোনও দিকে খেয়াল নেই। সকলেই এক মনে ধ্যান, জ্ঞান, গান ও পূজো নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন।

এইবার তাঁর তীর্থ দেখবার ভীষণ ইচ্ছে হলো। কিন্তু বেরতে

পারছেন না। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁর উপর সকলকে দেখবার ভার দিয়ে গেছেন। কিন্তু আবার ভাবলেন কেমন যেন ধীরে ধীরে সকলেই সকলের সঙ্গে মায়ার, ভালোবাসার বন্ধনে বাঁধা পড়ে যাচ্ছেন। অনেক ভেবে তিনি স্থির করলেন, তাঁকে বেরতেই হবে ভারতবর্ষ দেখতে।

সত্যি সত্যি একদিন বেরিয়ে পড়লেন। খালি পায়ে, নেড়া মাথায়, এক বস্ত্রে, হাতে একটা কমণ্ডলু আর কিছু বই। এই নিয়ে শুরু হলো যাত্রা। গেলেন তিনি কাশীতে। সেইখান থেকে শুরু হবে তাঁর ভ্রমণ।

কিছুদিন কাশীতে থাকার পর সরযূ নদীর তীরে অযোধ্যায় এসে হাজির হলেন তিনি। রামায়ণের সঙ্গে এই জায়গার নামটা জড়িয়ে আছে। এখানে কিছুদিন রামহিতদের সঙ্গে রামনাম করে কাটিয়ে—রওনা হলেন আগ্রা দেখতে। তাজমহল ও মোঘলদের নানারকম প্রাসাদ, মসজিদ দেখে চললেন বৃন্দাবনের পথে। এই সময় একটা মজার ঘটনা ঘটলো ঃ

মাঝ রাস্তায় সন্ন্যাসী নরেনের হঠাৎ নজরে পড়লো যে একটা লোক তামাক খাচ্ছে রাস্তার ধারে বসে। নরেনের তামাক খাবার

অভ্যাস ছিল। ওর হাতে তামাক দেখে তাঁর ভীষণ তামাক খেতে ইচ্ছে করলো। লোকটার কাছে গিয়ে বললেন—"দাও তো এক ছিলিম টানি।"

সে ভয়ে হুঁকো সরিয়ে নিয়ে বললো, "মহারাজ, আমি মেথর।"

নরেন চলতে শুরু করলেন। হঠাৎ মনে হলো, তিনি একি করলেন? মেথর বলে তার হাত থেকে হুঁকো খেতে পারলেন না? তিনি জাত-বিচার ভুলে তীর্থ দেখতে বেরিয়েছেন? লোককে জাত-বিচার ভুলতে বলছেন? তিনি আবার ফিরে চললেন। তারপর সেই মেথরের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করে তার সাথে এক কলকে তামাক খেয়ে তিনি রওনা হলেন বৃন্দাবনের পথে। বৃন্দাবনে কিছুদিন কাটিয়ে তিনি সমস্ত বিহার এবং আরও অনেক জায়গার নগর, গ্রাম পায়ে হেঁটে ঘুরে, তীর্থ দেখে তিনি আবার ফিরে এলেন কোলকাতায়।

এই রকম ভাবে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াবার সময় তিনি দেখলেন যে, ধর্ম বা ঈশ্বরকে ভক্তি করার লোকের অভাব নেই আমাদের ভারতবর্ষে। কিন্তু ভীষণ কু-প্রথা, কু-অভ্যাস,

কুসংস্কার এদের অন্ধ করে রেখেছে। এইগুলোকে যদি তাড়ানো না যায় তাহলে আমরা চিরকালই অন্ধকারে পড়ে থাকবো—যুবক সন্ন্যাসী নরেন এটা বুঝতে পেরে সেইভাবে কাজ শুরু করলেন।

মানুষকে ভীষণ ভালবাসতেন তিনি। এতো ভালবাসতেন যে মানুষের এতটুকু দুঃখ-কষ্ট তিনি একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর তীর্থে-তীর্থে ঘুরে বেড়ানোর সময় উল্লেখযোগ্য অনেক ঘটনা ঘটেছে।

একদিন নরেন সকলের সঙ্গে ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন, হঠাৎ দেখা গেল তিনি কাঁদছেন। অঝোরে কাঁদছেন। দুই গাল বেয়ে চোখের জল নীচে নেমে আসছে। কি ব্যাপার? সবাই অবাক!

—"কি হলো"? একজন জিজ্ঞেস করলেন।

নরেন কাগজটা এগিয়ে দিলেন উত্তরে। খবরটা দেখিয়ে দিলেন। সকলেই পড়লেন। খবরটা ছিল একটি লোক অনাহারে মারা গেছে। তাই, খবরটা পড়েই তাঁর চোখে জল এসে গিয়েছিল। এতেই বোঝা যায় কত বড় দরদী ছিলেন তিনি।

আর একদিন তিনি কেঁদে ফেলেছিলেন বেড়াতে বেড়াতে।

সেদিন তিনি দেখেছিলেন কতকগুলো ছোট ছোট জেলেদের ছেলে। তারা তাদের মায়েদের সঙ্গে কঠিন কাজ করার চেষ্টা করছে।

সারা ভারত ঘুরে বেড়ানোর সময় পরিব্রাজক নরেন বড় বড় পণ্ডিতের কাছে নানারকম শাস্ত্র পাঠ করেছেন। অনেক কিছু যা তিনি জানতেন না—তাও তিনি শিখে নিয়েছেন। এই শেখার সময় তিনি ধর্ম মানেন নি, জাত মানেন নি। মুচি, মেথর, ডোম সকলের সঙ্গেই তিনি থেকেছেন খেয়েছেন।

নরেন সবচেয়ে বেশী দুঃখ পেতেন মানুষের জাতিভেদ দেখে। উঁচু জাতের মানুষ নীচু জাতের মানুষকে ছুঁতো না। এক স্কুলে পড়তো না, এক কূয়োর জল খেতো না। অনেক সময় তিনি দেখতেন নীচু জাতের লোকদের এবং উঁচু জাতের লোকদের যাওয়ার রাস্তা পর্যন্ত আলাদা।

নরেনের আচার ব্যবহারে অনেক সময় গোঁড়া লোকেরা বিরক্ত হতো। কিন্তু তিনি সে সব গ্রাহ্য করতেন না। তিনি বলতেন, "দেশের দরিদ্র জনসাধারণকে সেবা করলেই ভগবানের সেবা করা হবে।"

এই দেশ ভ্রমণকালে সন্ন্যাসী নরেনের সাথে বহু রাজা-মহারাজার গভীর পরিচয় হয়েছিল। কিন্তু তাই বলে তিনি কোন মহারাজাকে তোষামোদ করেননি বা মন জুগিয়ে কথা বলেননি। অন্যায় দেখলে রীতিমত বলতেন—এতটুকু ভয় পর্যন্ত করতেন না।

একবার মহীশূরের এক মহারাজার সাথে তাঁর পরিচয় হলো। মহারাজা খুব ভাল উদার লোক ছিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী নরেন মহারাজার সামান্য দোষ দেখলেও বলতেন। ভয় করতেন না।

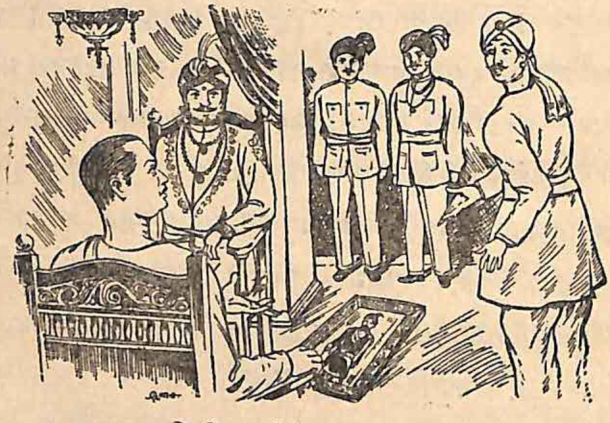
একদিন মহারাজা সন্ন্যাসী নরেনকে পরীক্ষা করার জন্যে ইচ্ছে করেই বললেন, "দেখুন স্বামীজী, এত বড় মহীশূর রাজ্যের আমি মহারাজা। অথচ আপনি আমাকে ভয় করেন না। আমাকে খুসী করার কোনও কিছুই করেন না। এ ভারী অন্যায়। আপনি যদি এর পর থেকে এ বিষয়ে সাবধান না হন তাহলে আপনার ভীষণ বিপদ হবে।"

নরেন একটু হাসলেন, "আমি একজন সন্ন্যাসী। সত্যই আমার জীবনের সাধনা, সত্যকেই আমি বিশ্বাস করি। আপনার ভয়ে সেই সত্যকে হারিয়ে আপনাকে খুশী করতে পারবো না

মহারাজ। আর তাছাড়া আপনি আমার কাছে এসব আশা করেন কি ভাবে ?”

মহারাজা এর পর এই ভয়হীন সন্ন্যাসীর পায়ে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন।

আর একদিন একটা মজার ঘটনা ঘটলো রাজপুতানার আলোয়ার রাজ্যের রাজার সঙ্গে। রাজার সাথে গভীর পরিচয়



হবার পর রাজা স্বামীজীকে ঠাট্টা করে বললেন, “স্বামীজী, আমি আপনার মতো পুতুলে বিশ্বাস করি না। ও সব আমার মানতে ইচ্ছে হয় না।”

দেওয়লালের দিকে তাকাতেই রাজার একটি ছবি নজরে এলো স্বামীজীর। তিনি বললেন, "আপনার ঐ ছবিটাকে নামানোর ব্যবস্থা করুন, আমি আপনার কথার উত্তর দিচ্ছি।"

ছবি নামানো হলো। বিবেকানন্দ রাজার কর্মচারিদের বললেন, "এবার যে কেউ ঐ ছবিটার ওপর থুতু ফেল।"

কেউ আর সাহস পায় না। মহারাজার ছবিতে থুতু ফেলবে কে ?

তখন স্বামিজী বললেন, "দেখলেন তো মহারাজ ? ঐ ছবিটা তো আর আপনি নন। ঐ ছবিটার মধ্যেও আপনি নেই। ওটা কিছুই না, শুধুমাত্র আপনার ছবি। কিন্তু তবুও কেউ সাহস পেল না ছবিটার অপমান করতে। কারণ প্রজারা মনে করেন ঐ ছবিকে অপমান করা মানেই আপনাকে অপমান করা। এ ছবি এঁদের নজরে পড়লেই এঁদের মনে আপনার কথা উদয় হয়। আপনাকে এঁদের মনে পড়ে। আমারও তেমনি। মাটির মূর্তিকে দেখলেই ঈশ্বরকে মনে পড়ে। তাই আমরা পুতুলকে পূজো করি না। পূজো করি ঈশ্বরকে।"

এমনভাবে ঘুরতে ঘুরতে তিনি একদিন একটা ছোট স্টেশনে

ট্রেন থেকে নেমে পড়লেন। তখন গরম কাল, ভীষণ গরম পড়েছে। খবর নিয়ে জানলেন যে এ জায়গায় জলও পয়সা দিয়ে কিনতে হয়। অথচ তাঁর কাছে একটাও পয়সা নেই। ভীষণ ক্ষিধে আর জল পিপাসা পেয়েছে। কোনও উপায় না দেখে তিনি ক্লান্ত হয়ে স্টেশনের একধারে বসে পড়লেন। একটু পরে তাঁরই কামরায় আসছিল একটি লোক—সে লোকটি একটু দূরে এসে বসলো। তার কাছে কাপড়ে বাঁধা খাবার ছিল, তাই খুলে খেতে শুরু করলো। বড় বড় লাড্ডু আর পুরী। আর নরেনের দিকে চেয়ে বলতে লাগলো, "যাদের পৃথিবীর কোন কিছুতেই লোভ নেই। নিজের জীবনকে যারা বাঁচাবার চেষ্টা পর্যন্ত করে না তাদের কষ্ট করতেই হবে। তুমি যখন মোটেই টাকা রোজগারের কথা চিন্তা কর না তখন তোমাকে না খেয়েই থাকতে হবে।"

নরেন শুধু শুনলেন। কোনও কথা বললেন না কিন্তু একটু পরেই দেখা গেল যে একটি লোক খুব তাড়াতাড়ি নরেনের দিকে এগিয়ে আসছে। তার হাতে এক ঘটি জল, একটা মাদুর, আর কিছু খাবার। নরেনের সামনে এসে বললো, "স্বামীজী, আপনি

এই খাবারটুকু খেয়ে নিন।" সে মাদুর বিছিয়ে দিল। খাবার গুছিয়ে এগিয়ে দিল। স্বামীজী অবাক! একি কাণ্ড!

নরেন বললেন, "আপনি ভুল করছেন। আমি তো আপনাকে কখনো দেখিনি, আপনাকে আমি চিনিও না।"

সে লোকটি বললো, "না, ভুল আমি করিনি, আমি ঠিকই করছি। আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি। দেখেছি যে, রামচন্দ্র আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে বলছেন, এক স্বামীজী এসেছে স্টেশনে, তুই তাড়াতাড়ি যা। সেই ক্ষুধার্ত স্বামীজীকে খাবার দে। সেই স্বামীজীকেও আমি স্বপ্নে দেখেছি। আপনিই সেই স্বামীজী। এখন দয়া করে আহার গ্রহণ করুন।"

তখন সেই আগের লোকটি লজ্জা পেয়ে ক্ষমা চাইলো নরেনের কাছে। এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে নরেনের জীবনে।

হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত ঘুরে পরিব্রাজক নরেন ভাবলেন তাঁকে বিদেশে যেতে হবে তাঁর নিজের দেশের ধর্ম প্রচারের জন্যে। বিদেশের লোকেরা তখন ভারতীয়দের ধর্ম, আচার ব্যবহারকে বড় ঘৃণা করতো। সেটা যে ভুল তাই

বোঝাবার জন্যে নরেন আমেরিকার শিকাগো শহরে ধর্মসভায় যোগ দেবার জন্যে তৈরী হতে লাগলেন।

তারপর একদিন খত্‌রী মহারাজার প্রাসাদে স্বামী বিবেকানন্দ নাম গ্রহণ করে আমেরিকার পথে পা বাড়ালেন।

শিকাগো যাবার পথে বিবেকানন্দের সাথে অনেক ছোট ছোট দেশের পরিচয় ঘটলো! তিনি দেখলেন সিংহলের বৌদ্ধ ধর্ম, বৌদ্ধ মঠ, দেখলেন তিনি মালয়, পিনাং, সিঙ্গাপুর। দেখলেন উঁচু পাহাড়ে ভর্তি সুমাত্রা দ্বীপ। সিঙ্গাপুর থেকে গেলেন হংকং। সেখানে কিছুদিন ছিলেন তিনি। তারপর জাপান। জাপানে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ মুগ্ধ হয়ে গেলেন। এই ভাবে ঘুরতে ঘুরতে স্বামীজী আমেরিকাতে এলেন, আমেরিকার বোস্টন শহরে এক ভদ্রমহিলার বাড়ীতে বাধ্য হলেন আশ্রয় নিতে। সে সময় তাঁকে সকলে দেখতে আসতো। নানা রকম ঠাট্টা করতো তাঁর সাথে। বিবেকানন্দ সব সহ্য করতেন। এভাবে দিন যেতে লাগলো! একদিন হঠাৎ এক পণ্ডিত লোকের সাথে তাঁর আলাপ হলো। তিনি স্বামীজীর জ্ঞান দেখে খুব খুশী হয়ে ধর্মসভার একটি লোককে চিঠি লিখে হাতে দিলেন। বললেন,

"আপনি ধর্মসভায় যোগদান করুন।" তারপর স্বামীজীকে একটি রেলের টিকিট কেটে দিলেন। স্বামীজী খুব খুশী হয়ে শিকাগো শহরের দিকে পা বাড়ালেন।

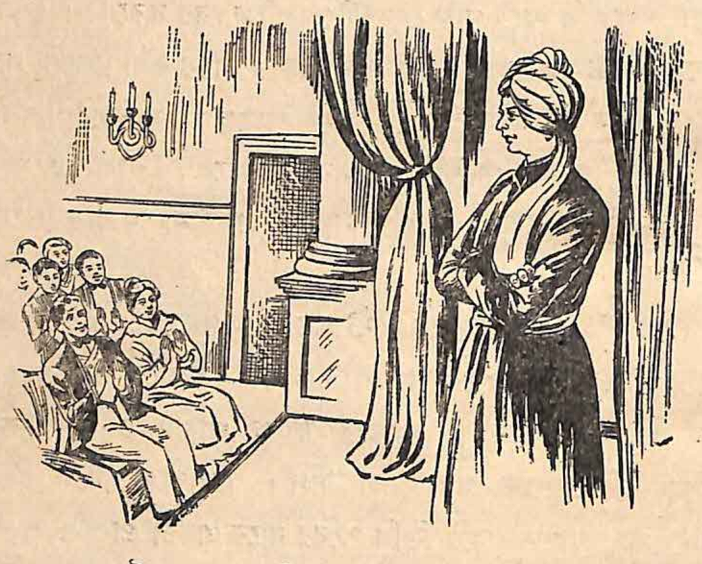
কিন্তু শিকাগো শহরে নেমে তিনি ভীষণ বিপদে পড়লেন। এই বিরাট শহরে কি করে সেই লোকটিকে খুঁজে বের করবেন। দু'এক জনকে জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু কেউই তাঁর সাথে কথা বললো না। বাইরে তখন ভয়ানক শীত। বরফ পড়ছে। রাত্তিরে থাকবার জন্যে একটু জায়গা কোথাও পেলেন না শহরে। খাবারের জন্যে লোকের দোরে দোরে ঘুরে কোথাও একদানা খাবার পেলেন না তিনি।

শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে স্টেশনে মালগুদামের একটা বড় কাঠের বাক্সের মধ্যে শুয়ে রাত কাটালেন। সকালে উঠে আবার শুরু করলেন খোঁজা। কারোর কাছে খাবার চাইলে কেউ তাড়িয়ে দিল, কেউ গালাগালি দিল। কোথাও কোন রকম ব্যবস্থা না করতে পেরে তিনি পথের ধারে একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর সামনে বসে পড়লেন ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত হয়ে।

কিছুক্ষণ পর সামনের ঐ বিরাট বাড়ীটা থেকে একটি মেয়ে

এগিয়ে এলো স্বামীজীর দিকে। জিজ্ঞেস করলো, "আপনি কি শিকাগো ধর্মসভায় যাবেন ?"

বিবেকানন্দ উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ"। তারপর সেই মেয়েটিকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। যেখানে যাবার জন্যে এসেছেন



সেখানকার ঠিকানাও হারিয়ে ফেলেছেন। সব শুনে মেয়েটি বিবেকানন্দকে তাঁর বাড়ীতে আশ্রয় দিল।

তারপর শিকাগোর সেই বিখ্যাত ধর্মসভার দিনটি এলো। অল্পবয়সী যুবক সন্ন্যাসী সেই বিখ্যাত ধর্মসভায় যা বললেন সবাই অবাক হয়ে গেলেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী-গুণীরা তাঁকে স্বীকার করে নিলেন। ধন্য ধন্য পড়ে গেল সারা পৃথিবীতে। ভারতের ধর্মকে, ভারতের ব্রতকে সারা বিশ্ব যা ভেবেছিল তা' নয় সেটা প্রমাণ করলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তারপর নানা জায়গায় বিবেকানন্দের বক্তব্য শোনবার জন্যে অনেক অনুরোধ এসেছে। তিনি বলেছিলেনও অনেক।

শিকাগো শহরের অনেক রাস্তায় স্বামীজীর বড় বড় ছবি টাঙানো হলো। রাস্তার লোক যাকে একদিন ঘৃণায় দূরে সরিয়ে দিয়েছিল—একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই যাদের দেশে বিবেকানন্দ পাননি একদিন তারাই তাঁকে মাথায় তুলে নিল। তাঁকে সম্মান জানালো। আদর করলো।

তারপর আমেরিকার অনেক গীর্জায় ক্লাবে ঘুরে, সারা ইয়োরোপ ভ্রমণ সেরে বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ একদিন আবার ভারতের মাটিতে ফিরে এলেন।

এখানে ফিরে এসে স্বামীজী আরও অনেক জায়গায়

ঘুরে বেড়ালেন। অবশেষে বেলুড়ে একটি মঠ তৈরী করলেন।

এত বড় যোগী, সর্বত্যাগী পুরুষ হয়েও তিনি কোনও সাধারণ মানুষের কষ্ট দেখে কোনদিন দূরে থাকতে পারেননি।

একবার কোলকাতায় ভীষণ প্লেগ রোগ শুরু হলো। বিবেকানন্দ তখন কোলকাতার বাইরে এক নির্জন পাহাড়ে বিশ্রামে গেছেন। সেইখান থেকে কোলকাতায় প্লেগের খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলেন। রামকৃষ্ণ মিশন তখন বহু লোককে এই কঠিন রোগের হাত থেকে বাঁচিয়ে ছিল। যে কোনও সময়ে এই লোকদের এবং বিবেকানন্দের পর্যন্ত অসুখ হতে পারতো। আর এই অসুখ হলে বাঁচা বড় শক্ত। তবুও তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে অবিরাম কাজ করে চললেন। টাকা-পয়সা সব ফুরিয়ে গেল মিশনের। শুধু বাড়ী আর জমিটুকু রইলো কেবল। সেটুকুও তিনি বেচে দেবেন বলে ঠিক করলেন। কেননা টাকা ছাড়া রোগীর সেবা হবে কি করে? তিনি সকলকে ডেকে বললেন, "আমাদের গাছতলায় শোবার এবং ভিক্ষে করে খাবার জন্যে সব

সময় তৈরী থাকতে হবে। কোনও সুখ ও আনন্দের মধ্যে যেন আমরা বন্দী না হই।”

পরে অবশ্য টাকার জোগাড় হয়ে গিয়েছিল—তাই বাড়ী আর জমি কোনটাই বিক্রী করতে হয়নি।

একদিন বেলুড় মঠে ঘুরতে ঘুরতে স্বামীজী তাঁর শিষ্যদের বললেন, “এখন যদি আমি মারা যাই তাহলে ক্ষতি কি?” তারপর একটি জায়গা দেখিয়ে বললেন, “আমি মারা গেলে তোমরা ঐখানে আমাকে দাহ করো।”

এই ঘটনার তিনদিন পর ৪ঠা জুলাই ১৯০২ সাল। সকালে দেখা গেল বিবেকানন্দকে একটা ভজন গাইতে গাইতে গঙ্গার ধারে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াতে। তাঁকে দেখে তখন মনে হচ্ছিল যে তিনি যেন কোন বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করছেন। দুপুরে সব শিষ্য-ভাইদের ডেকে একসঙ্গে সকলকে নিয়ে আহার শেষ করলেন। এমন তিনি কোনদিন করেন না। বিকেলে অন্য দিনের চেয়ে অনেক বেশী করে শিষ্যদের উপদেশ দিলেন, ধর্ম আলোচনা করলেন। অনেক কথা বললেন। তারপর সন্ধ্যের সময় কিছুক্ষণ বেরিয়ে ধ্যানে বসলেন। ধ্যান ভাঙার পর শিষ্যদের ডেকে

৪

বিছানায় শুয়ে শিষ্যদের মাথায় বাতাস করতে বললেন। এইভাবে একটি ঘণ্টা কাটলো। স্বামী বিবেকানন্দের হাতে জপমালা তিনি শুয়ে শুয়ে নামজপ করে চলেছেন। কোন সাড়া নেই, শব্দ নেই। রাত্রি ন'টা বাজলো। এমন সময় একটু নড়ে উঠলেন তিনি, তারপর দু'বার গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ চিরকালের মতো ধ্যানে মগ্ন হলেন। তিনি ইহলোক ছেড়ে পরলোকে পাড়ি দিলেন।

———